বিদ্যাসুন্দর ঃ ভারতচন্দ্রের অলংকৃত কলঙ্ক

শোহিনি ভট্টাচার্য

সহকারী অধ্যাপিকা, স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগ, বেথুন কলেজ

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যটি যে তিনটি অংশে বিভক্ত, তার মধ্যমটি হলো বিদ্যাসুন্দর বা কালিকামঙ্গলকাব্যের প্রথম ও তৃতীয় অংশের আরাধ্যা -- দেবী অন্নদা, আর এই দ্বিতীয়ভাগে দেবী কালিকা। বিদ্যাসুন্দর এর আখ্যান অব্যবহিতভাবে মূল শিরোনামাঙ্কিত দেবীর মঙ্গল গানের সঙ্গে যুক্ত নয়, একে প্রক্ষেপ বলা যায়। মূলকাব্যের কাহিনি পরম্পরায় এটি অনিবার্যও নয়, আবার এর আভ্যন্তরীণ ভাবটাও পৃথক সেক্ষেত্রে, প্রক্ষেপকে যুক্ত ক'রে শ্রোতার মনোরঞ্জনের জন্য নানান কাব্যিক কলাকৌশলের সাহায্য যেমন নিতে হয়েছে রাজসভার কবিকে, তেমনই শ্রুতিমধুর ও নান্দনিক উপস্থাপনের ক্ষেত্রেও সমান যত্নবান থাকতে হয়েছে তাঁকে চাকরি রক্ষার তাগিদে। এই বিদ্যাসুন্দরকথা মূলত প্রণয়লীলাত্মক -- দেবী কালিকার প্রসঙ্গ তাই শুরু থেকে অনুপস্থিত, পরে সংযোজিত হচ্ছে।

যুগসন্ধিক্ষণের কবি ভারতচন্দ্রের ভারতচন্দ্রত্ব এই বিদ্যাসুন্দর অংশটি রচনার জন্যেই। সমগ্র অলংকৃত কবিজীবনে তিনি যে 'রাজকণ্ঠের মণিমালা'টি গেঁথেছিলেন, সে মালার মধ্যমণি হলো বিদ্যাসুন্দর, যা নিঃসন্দেহে তাঁর কালাতিক্রমী তুরীয় জনপ্রিয়তার, সমালোচনার, কলঙ্কের এবং সাফল্যের মূল স্মারক আলোচ্য প্রস্তাবনাটি এই বিতর্কিত বিষয়টি নিয়েই।

বিদ্যাসুন্দর আখ্যানের মূলক্রমটি হলো মোটামুটিভাবে এইরকম ----- যুবরাজ - রাজকন্যা > গোপন প্রেম > রাজকন্যা অন্তঃসত্ত্বা > প্রথমে রাজার কোপ > মৃত্যুদণ্ড > দণ্ডমুকুব > বিবাহ। এখন প্রশ্ন, বিদ্যাসুন্দর আখ্যানের এমন মোটিফ ভারতচন্দ্র কোথায় পেলেন? জ্ঞানের আদান-প্রদান থেকে প্রেম — সংস্কৃত সাহিত্যে, বৌদ্ধ পরম্পরায় এই বিষয়ক একটি লোককাহিনির সন্ধান মেলে; তা প্রায় ২০০০ বছরের পুরোনোধ, উদয়ন - বাসবদত্তার কাহিনি। খ্রিস্টীয় ১ ম থেকে ৩য় শতকের মধ্যে এই মিথ নিয়েই ভাসের নাটক 'স্বপ্নবাসবদত্তম্'। আবার খ্রিস্টীয় ৪র্থ শতকে রচিত কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যে অবন্তী নামে এক গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায়; যাঁরা সেখানে থাকেন, তাঁরা 'উদয়নকথাকোবিদ্' বলে খ্যাত। এছাড়াও, বিদ্যাসুন্দর আখ্যানের অন্যান্য উপাদানগুলি হলো- সোমদেবভট্টের 'কথাসরিৎসাগর'। (খ্রিস্টীয় ১০ম শতক) এবং কাশ্মীরী কবি বিহ্লনরচিত - 'চৌরপঞ্চাশিকা' / 'চৌরীসুরতপঞ্চাশিকা' / 'চৌরপঞ্চাশৎ' (খ্রিস্টীয় ১১দশ শতক)।

বিহ্লনের কাব্যটি মূলত ৫০ টি শ্লোকে রচিত, মৃত্যুর প্রাক্‌মুহূর্তে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিতের স্মৃতিচারণ। বিহ্লন সম্পর্কে জনশ্রুতি, তিনি নিজে এক রাজকন্যার প্রেমে পড়ে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং নাকি এই কাব্য উচ্চারণ করেই নিস্তারলাভ করেন। সে যাই হোক, 'চৌরীসুরতপঞ্চাশিকা'র মূল বিষয়বস্তু ছিলো — চৌর অর্থে চতুর, সুরত অর্থে মিলন; অর্থাৎ সংক্ষেপে চাতুর্যের দ্বারা মিলন বিহ্লনের এ কাব্য নানান ভাষায় পল্লবিত হলো। দক্ষিণ ভারতে এসে কাহিনি অনেক বদলালো এবং তাতে শ্লোকের সংখ্যাও বহুগুণ বেড়ে গেলো। তার দুটি ভাগ— পূর্বপীঠিকা ও উত্তরপীঠিকা। পূর্বপীঠিকায় এলো একটা গল্প - রাজকন্যা ও যুবরাজের প্রেম, গোপন মিলন; আর উত্তরপীঠিকায় থাকলো - রাজার কোপ, বধ্যভূমিতে দণ্ডিত যুবরাজের স্মৃতিচারণ। উদয়নকথায় সুরশিক্ষার মধ্যে দিয়ে প্রেমের প্রসঙ্গটি ছিলো, কিন্তু মৃত্যুর প্রসঙ্গ ছিলো না। এভাবেই উদয়নবাসবদত্তা আর চৌরপঞ্চাশিকার গল্প মিলেমিশে জন্ম নিলো বিদ্যাসুন্দরের কাহিনি।

পূর্বভারতে যখন এলো, তখন আরও চমৎকার সংযোজন ঘটলো এ কাহিনির। এই অসাধারণ প্রাকৃত প্রণয়কথা ১৫-১৬ শতকে হ'য়ে গেলো দেবমাহাত্ম্যমূলক 'কালিকামঙ্গল' কাব্যবধ্যভূমিতে দৈবীকৃপায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত যুবরাজের শাস্তিমুকুব হচ্ছে এবং সসম্মানে রাজকন্যার সঙ্গে বিবাহ হচ্ছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বিদ্যসুন্দরের আদ্যন্ত প্রণয়লীলায় দেবী কালিকার কোনো ভূমিকা নেই, যুগের প্রভাবে তা নিছকই কাহিনির শেষাংশে আরোপিত। মজার বিষয়, বাংলা আখ্যানে এই কাহিনির মোট তিনটি পরিবর্তন ঘটলো —

১। গল্পে নাম বদলে গেলো চরিত্রের। 'চৌরপঞ্চাশিকা'র প্রথম শ্লোকে ছিলো — 'বিদ্যাংপ্রমাদগণিতামিব' অর্থাৎ মোহাচ্ছান্ন বিদ্যা। শ্লোকাংশটি থেকে ধরে নেওয়া হলো গল্পের নায়িকার নাম বিদ্যা। বাংলায় সমস্ত কাব্যগুলিতে তাই রাজকন্যার এই নামই বহাল থাকলো। বধ্যভূমিতে 'বিদ্যা' উচ্চারণে সুন্দরের বিলাপ প্রকৃতপক্ষে মহাবিদ্যা কালিকার আবাহন।

২। সংযোজিত হলো দেবী কালিকার প্রসঙ্গটি। আগেই বলেছি, বিদ্যা-সুন্দর এর আদ্যন্ত প্রণয়লীলায় চরিত্রটি নিতান্তই গুরত্বহীন।

৩। 'চৌরপঞ্চাশিকা'র 'চৌর' শব্দটির অর্থটি ছিলো — চাতুর্য; বাংলা গল্পে শব্দটির নতুন অর্থ দাঁড়ালো - চৌর্য বা চুরি। সব মিলিয়ে সৃষ্টি হলো এক জমজমাট প্রেমের গল্প।

এবার চলে আসি মূল প্রসঙ্গে — ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের ওপর অশ্লীলতার অভিযোগ উঠলো কেন? উনিশ ও বিশ শতকের ভারতচন্দ্র সমালোচকরা 'বিদ্যাসুন্দর অশ্লীল কিনা?' — এই বিতর্কে স্পষ্টতই দুটি পৃথক শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেছেন।

বিদ্যাসুন্দর এর গল্পটি মোটের ওপর একটি নিষিদ্ধ প্রেমের গল্প। অশ্লীলতার বিষয়ে আলোচনার শুরুতেই লক্ষ করলে দেখা যায় ;

প্রথমত, গল্পের কাঠামোতে যৌন মিলনের প্রসঙ্গ আছে মোট ৫ টি পরিচ্ছেদে —

বিদ্যাসুন্দরের কৌতুকারম্ভ

বিহার

বিপরীত বিহারারম্ভ
বিপরীত বিহার এবং
দিবাবিহার ও মানভঙ্গ

এই পাঁচটি অংশ আদিরসাত্মক। কিন্তু এই আদিরস রগরগে আদিরস নয়। বিহার ও বিপরীত বিহারারম্ভ এর মাঝে 'সুন্দরের বিদায় ও মালিনীকে প্রতারণা'র অংশ রয়েছে, যেখানে হাস্যরসের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। আবার বিপরীত বিহার ও দিবাবিহার বর্ণনার মাঝে রয়েছে 'সুন্দরের সন্ন্যাসীবেশে রাজদর্শন'ও 'বিদ্যাসহ সুন্দরের রহস্য'। এই টানা না বলার কৌশলই বুঝিয়ে দেয় ভারতচন্দ্র আগাগোড়া রগরগে আদিরসের বর্ণনা দিতে চান নি; বরং তা তিনি বারবার ভেঙে দিয়েছেন একটি নিরীহ কৌতুকের পরিচ্ছেদ দিয়ে।

দ্বিতীয়ত, বিহারের অংশগুলিতে শ্বাসাঘাতপ্রধান ক্ষিপ্রছন্দের ব্যবহার লক্ষ করার মতো। যেমন— সংস্কৃত শ্বাসাঘাতপ্রবল তোটক ছন্দের মেজাজটা তিনি যথোপযুক্তভাবে ব্যবহার করেছেন বিদ্যসুন্দরের দেহসম্ভোগ বর্ণনায় —

কুচশম্ভুশিরে নখচন্দ্রকলা।
বড় শোভিল ছাড়হ ঠাট ছলা।।
কুচহেমঘটে নখরক্তছটা।
বলিহারি সুরঙ্গপ্রবালঘটা।। (বিহারারম্ভ)

তৃতীয়ত, চরম যৌনমিলনের বর্ণনাতে ভারতচন্দ্র অসামান্য সাবলীল ও তুখোড়। কখনোও কোমল আল্‌তো ধ্বনির স্নিগ্ধ দোলায় এমন বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন; যাতে পড়তে গেলে ধ্বনির তরঙ্গে ভেসে বক্তব্যকে না শুনে এগিয়ে চলার সম্ভাবনা তৈরি হয় পাঠক-শ্রোতার মনে। কখনোও বা আবার ধ্বন্যাত্মক শব্দের বাহুল্যে তিনি আদিরসের বিষয়টিকে স্পষ্ট করে তুলেছেন, অন্যদিকে ধ্বনিঝঙ্কারের তরঙ্গের মাধ্যমে বিষয়টি যাতে শ্রোতাদের কানে তীব্র উত্তেজনা না জাগায় তাই তাকে আড়াল করার ব্যাপারেও সমান সচেতন থেকেছেন —

দুহ তনু ঝম্পন কম্পন ঘন ঘন
উথলিল মদনতরঙ্গে। (বিহার)

চতুর্থত, অলংকারের ব্যবহারটিও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। অর্থালংকারের ব্যবহারে বিপরীত বিহার-দৃশ্যের অশ্লীলতাকে সযত্নে আচ্ছন্ন করেছেন তিনি —

রায় বলে আমি করী তুমি কমলিনীশ্বরী
বান্ধহ মৃণালভুজপাশে।
আমি চাঁদ পড়ি ভূমি ফুল্ল কুমুদিনী তুমি
উঠ মোর হৃদয় - আকাশে।। (বিপরীত বিহারারম্ভ)

আবার কখনোও শব্দালংকারের চমৎকারিত্ব আচ্ছাদন করে থাকে আদিরস —

চুম্বন চুচুকৃতি শীৎকৃতি শিহরণ
কোকিল কুহরে গলায়ে (বিহার)

অথবা

ঘন অবিলম্ব নিতম্ব দোলে।
ঘুনু ঘুনু ঘন ঘুঙ্ঘুর বোলে।। (বিপরীত বিহার)

প্রসঙ্গত বলা যায়, ভারতচন্দ্র এখানে দুটি ঔচিত্য লঙ্ঘন করলেন সতর্কভাবে —

(ক) কামশাস্ত্রের যৌনমিলনে নারীর সক্রিয়তার ধারণা থাকলেও, বাংলা সাহিত্যে তার ব্যবহার ছিলো না — পুরুষতন্ত্রের এই taboo কবি ভাঙছেন।

(খ) বিপরীত রতিতে নারীর অধিক সক্রিয়তা সমাজনিষিদ্ধ ছিলো। ভারতচন্দ্র তা অতিক্রম করে গেলেন। উপরের আলোচনায় আমরা দেখলাম, ভারতচন্দ্র কতটা সচেতনভাবে অশ্লীলতাকে ভাষার চারুত্ব, অলংকারের চমৎকারিত্ব আর ছন্দের মনোহারিত্বে আবৃত করেছেন।

'কাব্যে অশ্লীলতা — আলংকারিক মত'নিবন্ধে প্রমথ চৌধুরি অশ্লীলতা কী? — এই বিষয়ে আলোচনাসূত্রে দেখাচ্ছেন — প্রাচীন ভারতীয় আলংকারিক মতানুযায়ী, অশ্লীলতা হলো তাই, যা 'ব্রীড়াজুগুপ্সামঙ্গলাতঙ্কদায়ী'। অর্থাৎ বামনাচার্যের মতে, যা ব্রীড়া, জুগুপ্সা, অমঙ্গল ও আতঙ্ক সৃষ্টিকারী, তাই হলো অশ্লীল।

ভারতচন্দ্র কিন্তু এই ব্রীড়া জাগান না। তিনি নিজেই 'বিহার' অংশের শেষে ভণিতায় বলছেন —

সহচরীগণ যদি সন্নিধি আইল
নম্রমুখী অতি লাজে।
ভারতচন্দ্র কহে শুন লো সুন্দরি
লাজ করো কোন কাজে।।

প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রে, নরনারীর প্রত্যক্ষ যৌনমিলনকে শিল্প ও বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখা হতো; বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্র এবং খাজুরাহোর ভাস্কর্য সে প্রমাণ বহন করে। সেখানে এই ব্রীড়া বা লজ্জার দৃষ্টি ছিলো না। ভারতচন্দ্রও এ বিষয়ে সমমনস্ক, সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাচীন ঐতিহ্যই তিনি মানলেন। প্রাক্‌বিবাহমিলন অমঙ্গলদায়ী— এমন অভিযোগ উঠতেই পারে। কিন্তু ভারতচন্দ্র দেহমিলনের পূর্বেই বিবাহের মধ্যে দিয়ে তাকে মাঙ্গল্যে ভূষিত করেছেন 'বিদ্যাসুন্দরের কৌতুকারম্ভ' এর সূচনায়—

বিবাহ নহিলে হয় কেমনে বিহার।
গান্ধর্ব্ববিবাহ হৈল মনে আঁখি ঠার।।
কন্যাকর্ত্তা হৈল কন্যা বরকর্ত্তা বর।
পুরোহিত ভট্টাচার্য্য হৈল পঞ্চশর।।

ফলে, প্রকৃতপক্ষে এ বিহার প্রাক্ বিবাহ নয়। সুতরাং সে অর্থে কোনো জুগুপ্সা বা গোপনীয়তাও নেই। আর যেহেতু অমঙ্গল ও জুগুপ্সা নেই — তাই আতঙ্কও নেই।

প্রমথ চৌধুরি ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতার মধ্যে এই art- কেই চিহ্নিত করেছেন —

"The Vidyasundar is a love story, a novel in verse. But the love he treats of has nothing spiritual or ideal about it, but is the common mundane passion which lends itself to humorous, and even indelicate treatment ..... Bharatchandra's poem, if I may say so, is a study in nude-not of Psyche, but of Venus Pandemos."

— ভারতচন্দ্রের এই অনাবৃতি ন্যুড ভাস্কর্যের মতো। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধে বলেছিলেন — 'সুবৃহৎ অনাবরণের মধ্যে অশ্লীলতা নাই' — ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর আসলে তাই। ভারতচন্দ্রের রচনাসমূহের অন্যতম সম্পাদক মদনমোহন গোস্বামী এ বিষয়ে বলবেন —

'বিদ্যাসুন্দর সৌন্দর্যময় ('A thing of beauty') এবং সেইজন্যই ইহা চিরানন্দদায়ী (' A joy for ever')। এই সৌন্দর্যের অভাবেই রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দর' কালজয়ী হইতে পারে নাই। ভারতচন্দ্রের কাব্যের 'উজ্জ্বলরস' আবিল হইলেও উজ্জ্বল। যে রাষ্ট্রিক ও সামাজিক অধোগতির চিত্র ইহার মধ্যে লক্ষিত হয় তাহা অষ্টাদশ শতকের আকস্মিক সৃষ্টি নহে।'

রঙ্গলাল বা মধুসূদনও ভারতচন্দ্রকে সমর্থন জানিয়েছেন । রমেশচন্দ্র দত্ত এ বিষয়ে সপ্রশংস ছিলেন; এমনকি রবীন্দ্রনাথও ভারতচন্দ্রের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলেন নি। বিদ্যাসুন্দর প্রণয়কথা আদিরসাত্মক; একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, আমাদের দেশের প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ঐতিহ্যে (যেমন-কুমারসম্ভব, গীতগোবিন্দ ইত্যাদি) আদিরসাত্মক কাহিনিতে দেহমিলনের বর্ণনা স্বীকৃত। কিন্তু উনিশ শতকের বিদ্যাসুন্দর চর্চায় বাঙালি সমালোচকের একটা বৃহত্তর অংশ ভারতচন্দ্রকে কাঠগোড়ায় এনে দাঁড় করিয়েছেন। উনিশ শতকীয় পরিমণ্ডলে অশ্লীলতা সম্পর্কে জন্ম নিয়েছিল এক নতুন দৃষ্টিকোণ। এই রক্ষণশীলতাকে যদিও J.C. Ghosh বলেছেন 'middle class mentality', কিন্তু একথা পুরোপুরি সত্য নয় — এই জনমানস ছিল অনেকটাই ভিক্টোরীয় নৈতিকতায় আচ্ছন্ন। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র মনে করছেন ভারতচন্দ্র খারাপ কবি, হীরামালিনী চরিত্র ছাড়া উল্লেখ করার মতো কিছুই নেই—

"His works are disfigured, too, by a disgusting obscenity which unfits them for publication at a time when Bengali readers are not all the rougher sex."

'বিরক্তিকর অশালীনতা'র বিরুদ্ধে এই বঙ্কিমী ক্ষোভ যা সেই সময়ে সম্প্রসারিত হয়েছিল হেমচন্দ্র, রাজেন্দ্রলাল থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত — তাকে শুধুমাত্র সমকালীন মানসিকতা বলে বিবেচনা করলে ভুল হবে। তবে উনিশ শতকে এর বিরূপ সমালোচনাও ছিল। উনিশ শতকের নব্বই এর দশকে দাঁড়িয়ে অশ্লীলতার প্রশ্নে ভারতচন্দ্রের পক্ষ নিয়েছিলেন গৌরদাস বৈরাগীর মতো মানুষ। অবশ্য এই সপক্ষতার দৃষ্টান্ত উনিশ শতকে প্রায় অলভ্য সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ভারতচন্দ্র তাঁর সমকালে অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত হন নি, এমনকি বর্তমান কালেও হন নি — শুধু উনিশ শতকে এক আধা - ঔপনিবেশিক মানসিকতার শিকার হয়েছিলেন তিনি।

এবার দেখা যাক, ভারতচন্দ্রের আধুনিক মননের অন্যান্য দিকগুলো। প্রথমেই লক্ষণীয়, রাজার পৃষ্ঠপোষকতা করার কোনো দায় বিদ্যাসুন্দর কাহিনির বুনোটের ক্ষেত্রে ভারতচন্দ্র মানেন নি। প্রায় বিনা ভূমিকায় বিদ্যা ও সুন্দরের কথা আরম্ভ করছেন তিনি। মূল মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে এই আখ্যানটিকে জুড়ে দেবার পূর্বসূত্রটুকু লক্ষণীয়। কাব্যের প্রথমভাগে দেবী অন্নদার কৃপাধন্য ভবানন্দ মজুমদার এই অংশে বর্ধমানে এসে এই কাহিনি শোনেন এবং সুড়ঙ্গদর্শন করে এসে মানসিংহকে বিবরণ দিয়ে সব জানান। এই নিয়েই কাব্যের দ্বিতীয়ভাগ কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর।

পুরো কাহিনির মধ্যে একটি নাট্যগুণ আছে, সামাজিক বৈশিষ্ট্যও প্রকাশ পেয়েছে। আবার 'কোটাল কর্তৃক চোর ধরা' অংশে থেকে গেছে ডিটেক্‌টিভ গল্পের রেশ। সুড়ঙ্গের আবিষ্কারের মাধ্যমে চোরধরার এই চিত্তাকর্ষক ঘটনাটি সম্পূর্ণ ভারতচন্দ্রের মস্তিষ্কপ্রসূত।
আবার তার সঙ্গে পরতে পরতে মিশিয়ে দিয়েছেন নির্মল হাস্যরস। 'নারীগণের পতিনিন্দা' অংশটিও মঙ্গলকাব্যের প্রথানুগত্য থেকে পৃথক। সুন্দরের রূপে মোহিত হ'য়ে পুরনারীরা নিজ স্বামীভাগ্যের নিন্দা করলেও বিষয়টিতে অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মতো একঘেয়েমি নেই। এ কাব্যে পুরনারীদের অভিযোগ সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিন ভাগে বিভাজ্য —

(ক) যাদের স্বামী বিকৃত - বিকলাঙ্গ; ফলে দাম্পত্যযাপন ব্যাহত হয়।

(খ) যাদের স্বামীরা রাজসরকারের চাকুরিজীবী; জীবিকার কারণে ব্যস্ত থাকার ফলে স্ত্রীকে যথাযথ সঙ্গ দিতে পারে না (রাজসভাকবি ভারতচন্দ্র নিজেও কি এই শ্রেণিভূক্ত নন !)

(গ) যারা হিন্দুসমাজের বহুবিবাহ নীতির ফলে নিষ্পেষিত।

তাছাড়া, অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মতো দেবদেবীর পূজা প্রচার ও মাহাত্ম্যবর্ণনের সীমাবদ্ধতা নেই এই কাহিনিতে। শুধু বন্দী অবস্থায় সুন্দর মশানে যে কালীস্তুতি করেছে তা একমাত্র দেববন্দনা। ৫০ অক্ষরে (১৬ স্বরবর্ণ, ৩৪ ব্যঞ্জনবর্ণ) সুন্দরের চৌতিশাস্তব এবং তারপর সন্তুষ্ট কালিকার ভূতপ্রেতসহ আগমন ও কৃপা। ভারতচন্দ্রের বিরহবিধুরা নায়িকা বিদ্যার বারোমাস্যাটিও ভিন্নধর্মী। এই বারোমাস্যাটি গঠনগত দিক থেকে প্রাকৃতিক ঘটনার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে মঙ্গলকাব্যের প্যাটার্ন মানলেও, বিদ্যার যৌবনযাপন বিষয়ক সুখের বারোমাস্যা। মূল কাব্যের প্রথম ও তৃতীয় অংশে আছে দুঃখ দারিদ্র্য; কিন্তু এই দ্বিতীয় অংশে দুটি অভিজাত নরনারীর প্রেমের ছবি চিত্রিত । তাই বারোমাস্যাটিও সুখের। এটাই রাজসভার কাব্যের মেজাজ। অভিজাত কবির মেজাজ —

'....free aristocratic morality that prevailed up to the eighteenth century'

সুতরাং বলা যেতে পারে, ভারতচন্দ্র রাজসভার কবি হিসেবে এই অংশে তুলনামূলকভাবে অনেক স্বাধীন ছিলেন, তাই তাঁর প্রকৃত মেজাজটা ধরা পড়েছে এই খণ্ডরচনায়। অবশ্য অনেকে মনে করেন রাজসভার কৌতূহল আর আদিরস শ্রবণের আকাঙ্ক্ষা মেটানোর জন্যেই যদি ভারতচন্দ্র এই অংশটি রচনা করে থাকেন, তাহলে তিনি কোথায় স্বাধীন?

আমাদের প্রতিযুক্তিটা সেক্ষেত্রে অন্য। ভারতচন্দ্র গ্রাম্য কবি নন, রামপ্রসাদের মতো অনভিজাত কবিও নন। তিনি ব্যক্তিক জীবনে অনেক দুঃখ- দারিদ্র্য সহ্য করেছেন বটে, কিন্তু তিনি অভিজাত পরিবারের সন্তান। কৃষ্ণনগর রাজসভার মেজাজটার সঙ্গে তাঁর নিজের মেজাজটা খাপ খায়। এই সমান্তরাল অভিজাত মানসিকতা তাঁর ছিলো, আর ছিলো সুশিক্ষিত, পরিমার্জিত, রুচিশীল অথচ সংস্কারশূন্য একটা মন। এই মন নিয়েই তিনি বিদ্যাসুন্দর লিখতে বসেছিলেন; শুধুমাত্র রাজার আজ্ঞায় অনিচ্ছাবশত এ কাব্যাংশ লিখলে তা এত উন্নতমানের রচনা হতো না — সৌন্দর্যস্পৃহা কবিরও ছিলো।

পরিশেষে বলা যায়, এ কাব্যের প্রথমখণ্ড 'অন্নদামঙ্গল' বা 'শিবায়ন' - এ ভারতচন্দ্র যেমন পৌরাণিক ঋণ মিটিয়েছেন, তৃতীয়খণ্ড 'মানসিংহ' – এ মিটিয়েছেন পৃষ্ঠপোষকের ঐতিহাসিক ঋণ; আর দ্বিতীয়খণ্ড ' কালিকামঙ্গল' বা 'বিদ্যাসুন্দর'-এ সাহিত্যিক ঋণ। সারাজীবন ধরে বেশ কিছু রচনা সৃষ্টি করলেও, ভারতচন্দ্রের মূল কবিখ্যাতি অন্নদামঙ্গলকাব্য রচনার জন্যই। অথচ যে শিরোনামাঙ্কিত দেবীর মঙ্গলগান, সেই দেবী অন্নদার মাহাত্ম্যবর্ণন মূলকাব্যের প্রথম ও তৃতীয় খণ্ডে থাকলেও, ত্রিধাবিভক্ত এই কাব্যে সাহিত্যিক দ্রোহটি নিষ্পন্ন হয়েছে মধ্যমাংশে; জনপ্রিয়তা ও নিন্দার বিপ্রতীপ টানে তাই বিদ্যাসুন্দর ঋদ্ধ । এই খণ্ডরচনাতেই আমরা চিনতে পারি যুগসন্ধিক্ষণের কবির প্রকৃত স্বরূপকে, যেখানে তাঁর হাত ধরে বাংলা সাহিত্য মধ্যযুগীয় প্রথানুগত্যের প্রান্তদেশে দাঁড়িয়ে আধুনিকতার প্রথম সূর্যোদয় দেখেছিলো। প্রথম প্রভাতের আলোয় যেমন একটা শীতল অস্পষ্টতা জড়িয়ে থাকে, তেমনভাবে আধুনিকতার সূচনালগ্নেও উনিশ শতকীয় মূল্যবোধের নিক্তিতে সমালোচকদল তাঁকে যথাযথভাবে চিনতে পারেন নি। গতানুগতিকতার কষ্টিপাথরে যাচাই করতে গিয়ে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তিকে করেছেন কালিমালিপ্ত। কিন্তু আমরা একবিংশ শতকে দাঁড়িয়ে মুক্তবুদ্ধি দিয়ে বিচার ক'রে একথা সোচ্চারে স্বীকার করতে পারি যে — বিদ্যাসুন্দর যদি একান্তই ভারতচন্দ্রের কলঙ্করেখা হয়, তবে নিঃসন্দেহে সে কলঙ্ক হয়ে উঠেছে তাঁর সমগ্র কবিজীবনের অলংকার, অলংকৃত কলঙ্ক।

ঃ তথ্যসূত্র ঃ

১) ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী; অন্নদামঙ্গল - ২য় খণ্ড; সম্পা, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; ৫ম সংস্করণ - মাঘ, ১৪১৯
২) ভারতচন্দ্র; সংকলন ও সম্পাদনা মদনমোহন গোস্বামী; সাহিত্য অকাদেমি;পরিচয় পর্ব; ১৯৬১
৩) প্রবন্ধ সংগ্রহ; প্রমথ চৌধুরী; বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ; অখণ্ড - জুন, ২০১০
৪) রাজসভার কবি ও কাব্য; দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
৫) বিদ্যাসুন্দর কাব্যধারা ঃ ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার; ড: কেয়া চট্টোপাধ্যায়; বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ; ২০১২
৬) চৌরপঞ্চাশিকা; অনু ড:সুকুমারী ভট্টাচার্য; সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার (১৩ দশ খণ্ড); নবপত্র প্রকাশন; ১৯৮২
৭) কবি ভারতচন্দ্র ; শঙ্করীপ্রসাদ বসু; দেজ পাবলিশিং; ২০০০
৮) বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান; ওয়াকিল আহমেদ; খান ব্রাদার্স অ্যাণ্ড কোম্পানি ; ৮ম সংস্করণ - এপ্রিল, ২০০৯
৯) Bengali Literature; J.C. Ghosh; Oxford University Press; Nadia Period; 1948
১০) Bengali Literature; Bankimchandra Chattopadhyay; Calcutta Review; 1871

ঃ ঋণস্বীকার ঃ

বিশ্বভারতী- স্নাতকোত্তর পাঠক্রমের সূত্রে অন্নদামঙ্গল পড়িয়েছিলেন শ্রদ্ধেয় মাষ্টারমশাই ড: অভ্র বসু। এই লেখায় তাঁর কাছে থেকে গেলো অনস্বীকার্য ঋণ।